সেলিনা হোসেনের 'নীলময়ূরের যৌবন' কাহ্নপাদের জীবনচর্যা

ডঃ মৃণাল কান্তি দাস, সহযোগী অধ্যাপক, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগ
ইসলামপুর কলেজ,

জীবনীমূলক উপন্যাস জীবন এবং উপন্যাসের এক সম্পৃক্ত রূপ। কাহিনীকার যাঁর জীবনকে বিবৃত করেন তাঁর প্রতি যেমন বিশ্বস্ত থাকেন তেমনি 'জীবনরসে'র প্রতিও তিনি সমান ঔচিত্যবোধ দেখান। উভয়ই উভয়ের পরিপূরক। কাহিনীকারের সেই স্বাধীনতাটুকু থাকে যেখানে জীবনের পাশাপাশি উপন্যাসের কাহিনী অংশে কল্পনা শক্তির মিশেল ঘটিয়ে থাকেন। সাহিত্য সমাজের দর্পণ; তবুও সমাজবিবিক্ত নানা প্রসঙ্গও ফুলে ফলে পত্রে ভরিয়ে দেয়। কাহিনীকারেরা জীবনী আর উপন্যাসের দুটি কক্ষে ইতস্তত বিচরণশীল। একবার জীবনের কক্ষে উঁকি দেন আর একবার উপন্যাসের কক্ষে উঁকি দেন। জীবনীমূলক উপন্যাস এই দুইয়ের সার্থক মেলবন্ধন। যে যত ভালো বন্ধন ঘটাতে পারেন তিনি ততো বড়ো ঔপন্যাসিক। আবার আত্মজীবনীমূলক উপন্যাসের মধ্যে থাকে কাহিনীকারের নিজের জীবনকে ফিরে ফিরে দেখা। কখনো বা তাতে থাকে স্মৃতিমেদুরতা; কখনো বা থাকে স্মৃতিভারকাতরতা। আত্মজীবনীমূলক উপন্যাসের এই নিজত্ব বা নিজস্বতা অনেকসময় কুয়াশায় ঢাকা থাকে। মেঘাবৃত থাকে। মেঘ কুয়াশাযুক্ত এই নিজত্ব অনেকসময় ছদ্মজীবনীমূলক উপন্যাসের জন্ম দেয়। কাহিনীকার অনেকসময় আড়ালে চলে যান। আবার হঠাৎ সামনে আসেন। কোথাও ছদ্মবেশ ধারণ করেন। তবে সবসময় ব্যক্তিত্বও নয়, নিজত্বটুকুই আত্মজীবনীমূলক উপন্যাসের পরম উপজীব্য। এই নিজত্বটুকু স্মৃতির আবেশে বিহ্বল; অনুষঙ্গের মন্থরতায় ভরা; এরা ব্যর্থতার করুণ সাক্ষী; প্রত্যাশার উদ্দামতায় চঞ্চল। সর্বোপরি এরা লৌকিক অভিজ্ঞতার ফসল। এইটুকুই দায় তাদের - To render the truth of experience. 'শ্রীকান্ত'উপন্যাসে শরৎচন্দ্র যেন অনেক আয়াসে ক্রন্দনের বেগটাকে সামলে নিয়েছেন, যদিও জল শুকিয়ে যায় নি। 'নিকোলাস নিকলবি'-তে ডিকেন্স ঠিক আশাবাদী নন প্রত্যাশা মুখর। 'ধাত্রীদেবতা'য় তারাশঙ্কর উপলব্ধির একটি তত্ত্বরূপের প্রলেপ দাহকে জুড়িয়ে দিয়েছে। ছদ্মজীবনীমূলক উপন্যাসের বৈশিষ্টগুলিকে আমরা সূত্রাকারে তুলে ধরতে পারি - (ক) উপন্যাসের কোনো চরিত্রের মধ্যে লেখকের জীবনের ছায়াপাত ঘটতে পারে, (খ) চরিত্রটি কাল্পনিক হবে, (গ) লেখকের জীবনের খন্ড অংশ উঠে আসে, (ঘ) জীবনের আত্মোপলব্ধি এব্য অনুভূতি সেই কল্পিত চরিত্রের মধ্যে হানা দেয়।

ছদ্মজীবনীমূলক উপন্যাস হিসেবে আমরা সতীনাথ ভাদুড়ীর 'জাগরী' উপন্যাসকে তুলে ধরতে পারি। 'জাগরী'-তে বিলু চরিত্রটি কালপনিক। কিন্তু বিলু চরিত্রের সঙ্গে সতীনাথের ভাবনার অনেক মিল আছে। আবার অমিলও আছে। বিলু সোস্যালিস্ট পার্টি অফ কংগ্রেস দলের এবং ভাবধারার সঙ্গে যুক্ত। কিন্তু লেখক এই মতবাদে বিশ্বাসী নয়। আবার তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'কবি' উপন্যাসে নিতাই কবিয়ালের সঙ্গে লেখকের জীবনের হয়তো কোনো ঘটনার যোগ নেই কিন্তু ''কালো যদি মন্দ তবে কেশ পাকিলে কান্দ কেন?'' -এই উপলব্ধি নিতাইয়ের

পাশাপাশি স্বয়ং তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়েরও। আর এখানেই ছদ্মজীবনীমূলক উপন্যাসের আভাস পাওয়া যায়।

আধুনিককালে রচিত প্রাচীন এবং মধ্যযুগের কবিসাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বকেন্দ্রিক কয়েকটি জীবনীমূলক উপন্যাস -

কবি বন্দ্যঘটী গাঞ্রির জীবন ও মৃত্যু (১৯৬৭) - মহাশ্বেতা দেবী
অমাবস্যার গান (১৯৭১) - নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়
নীল ময়ূরের যৌবন (১৯৮১) - সেলিনা হোসেন
মনের মানুষ (২০০৮) - সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
রাজপাট ধর্মপাট (২০০৮) - অভিজিৎ সেন
কাহ্ন (২০১০) - শিবাশিস মুখোপাধ্যায়
আয় মন বেড়াতে যাবি (২০১০) - সুব্রত মুখোপাধ্যায়
গোরা (২০১২) - শৈবাল মিত্র
ক্ষমা করো হে প্রভু (২০১৩) - রূপককুমার সাহা
এক জন্মেই জন্মান্তর (২০১৪) -অলখ মুখোপাধ্যায়

সলিনা হোসেন। জন্ম ১৪ জুন, বাংলাদেশের রাজশাহী শহরে, ১৯৪৭ সালে। প্রথম গল্পগ্রন্থ ‘উৎস থেকে নিরন্তর’ ১৯৬৯ সালে প্রকাশিত হয়। বর্তমানে উপন্যাসের সংখ্যা ৩০টি। গল্পগ্রন্থ ১২টি। প্রবন্ধগ্রন্থ ৮টি। শিশুসাহিত্য ১৭টি। উল্লখযোগ্য উপন্যাসগুলি হল - ‘যাপিত জীবন’, ‘নিরন্তর ঘন্টাধ্বনি’, ‘হাঙর নদী গ্রেনেড’, ‘নীল ময়ূরের যৌবন’। ইংরেজি, হিন্দি, উদু, মারাঠি, কানাড়ি, মালয়ালম, রুশ, মালে, ফরাসি, জাপানি প্রভৃতি ভাষায় তাঁর বেশ কয়েকটি গল্প অনুদিত হয়েছে। তিনি বাংলা একাডেমি পুরস্কারসহ দেশের নানা পুরস্কারে ভূষিত। সর্বশেষ পুরস্কার লাভ করেন ২০০৬ সালে দক্ষিণ এশিয়ার সাহিত্যিক হিসেবে দিল্লির সংগঠন অরগানাইজেশন অফ আন্ডারস্ট্যানডিং অ্যান্ড ফ্রেটারনিটি কর্তৃক ‘রামকৃষ জয়দয়াল হারমোনি অ্যাওয়ার্ড’।

সেলিনা হোসেনের লেখা ‘নীল ময়ূরের যৌবন’ উপন্যাসটি ১৯৭১ সালে প্রকাশিত হয়। এটি একটি জীবনীমূলক উপন্যাস। চর্যাপদের পুননির্মাণ করা হয়েছে এই উপন্যাসে। চর্যাপদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ১৩টি পদ রচনা করেন কাহ্নুপাদ। কাহ্নুপাদের জীবন সম্পর্কে তেমন কিছু তথ্য পাওয়া যায় না। অনেকে মনে করেন ‘যোগরত্নমালা হে বজ্রপঞ্জিকা’ কৃষণাচার্য নাম দিয়ে কাহ্নুপাদের লেখা। কাহ্নুপাদের জীবনকে নিয়েই এই উপন্যাসটি রচিত হয়েছে। কাহ্নুপাদের লেখা পদগুলি এই উপন্যাসের উপাদান হিসেবে বিবেচিত হয়েছে।

চর্যাপদে সমকালীন বাংলাদেশের সমাজ ও লোকিকজীবনচিত্র উঠে এসেছে। ‘নীল ময়ূরের যৌবন’ উপন্যাসেও সেই পরিবেশ রক্ষিত হয়েছে। ভুসুকুর ভাই দেশাখ, কাহ্নু, রামক্রীদের হরিণ শিকারের দৃশ্য; ডোম্বির নৌকা বাইবার দৃশ্য; চৌষট্টি ঘড়া সাজিয়ে দেবকী ও রামক্রী নামক দুই চরিত্রের মদ বিক্রির দৃশ্য; ধনশ্রী ও ভৈরবীর নিত্য অভাবের মধ্যে বাড়িতে অতিথির আনাগোনার চিত্র, নদীতে বড়ো মাছের ঘাই মারার প্রসঙ্গ; অন্ত্যজদের মাদল-পটহ বাজিয়ে সারারাত উৎসবের দৃশ্য; মাটির উর্বরা শক্তি বৃদ্ধি ও ফসলের কামনায় জোড়ায় জোড়ায় অবিবাহিত

নারীপুরুষের মিলনের প্রসঙ্গ; দুঃখ-দারিদ্রক্লিষ্ট সাধারণ মানুষের উপর রাজার অকথ্য শোষণ নিপীড়নের প্রভৃতি প্রসঙ্গ এই উপন্যাসের পরতে পরতে জড়িয়ে আছে।

কাহ্নুপাদের বাড়ির অবস্থা তথৈবচ। তাঁর পত্নী শবরী। শবরী গুঞ্জা ফুলের মালা পরতে ভালোবাসে। মেঘডম্বুর শাড়ি তার প্রিয়। মাথায় ময়ূরের পালক গোঁজে। ঘরে ময়ুর পোষে। ঘর বলতে চাঁচর বেড়ার ঘর। ঘরের সামনে আনেক কাপাস গাছ আছে। হরিণের চামড়া বিছিয়ে কাহ্নুপাদের জন্য গীত রচনার পরিবেশ তৈরি করে। সেজেগুজে সবসময় কাহ্নুর পাশেপাশে থাকে। শবরী কাহ্নুর কবিপত্নী হলেও কবিপ্রিয়া হয়ে উঠতে পারে নি।

কাহ্নুর বন্ধু ভুসুকু। সেও বাংলা ভাষায় গীত লেখে। কুক্করীপাদও গীত রচনা করেন। কুক্করীপাদ সমাজসংসারের মধ্যে থাকেন না। তিনি অরণ্যচারী, পর্বতবাসী। তাঁর গান - 'রুখের তেন্তুলি কুম্ভিরে খাঅ' কাহ্নুকে মুগ্ধ করে। ভুসুকু বাণিজ্যে গিয়ে বহুদিন নিখোঁজ। ভুসুকর ঘরে তাঁর স্ত্রী সুলেখা, ভাই তিরন্দাজ দেশাখ, বাবা মা, বোনেরা আছে। চরম দারিদ্রের সংসার। সুলেখা ভুসুকুর অপেক্ষায় শেষপর্যন্ত থাকতে না পেরে গ্রামের পাকা চাষী সুদামের সঙ্গে ঘর বাঁধে। দীর্ঘদিন পর ভুসুকু ঘরে ফিরে স্ত্রীর ঘর ছাড়ার ঘটনায় পাগলপ্রায় হয়ে যায়।

কাহ্নু রাজকর্মচারী। রাজসভায় রাজার পাখা টানে। দেখে রাজদরবারে পন্ডিতেরা প্রায়ই সংস্কৃত ভাষায় শাস্ত্রালোচনার সভা বসায়। ব্রাহ্মণেরা সবসময় কোণঠাসা করে রাখে ওকে। ও নিজে একজন কবি। সে চায় তার লৌকিক ভাষায় লেখা গীত রাজসভায় পাঠ করতে এবং তার গীত শুনে রাজা তাকে উপযুক্ত সম্মান দিক। ভেতরে প্রকাশের আকাঙ্ক্ষা যখন তীব্র হয় এই রাজসভা তছনছ করে ফেলতে ইচ্ছে করে। ও প্রবলভাবে অনুভব করে যে ব্রাহ্মণ পন্ডিতদের রাশভারি সংস্কৃত ভাষার পাশাপাশি ওর লৌকিক ভাষাকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে, এ ভাষাতেই কথা বলে ওর মতো শতশত মানুষ। রাজমন্ত্রী দেবল মিত্র কাহ্নুর গীত কে মনে করে 'ছুঁচোর কেত্তন'। কাহ্নু স্বপ্ন দেখে এক স্বাধীন ভূখণ্ডের যার দক্ষিণে থাকবে বন এবং যেখানে রাজায় প্রজায় কোনো ভেদ থাকবে না এবং প্রত্যেকেই নিজের মতো করে তাদের মনের কথা বুকের ভাষা বলতে পারবে।

কাহ্নুর পত্নী শবরী হলেও তার প্রিয়া হল ডোম্বি।সে নদীঘাটে খেয়া পারাপার করে। তার স্বামী তাকে ছেড়ে অন্য সঙ্গিনীর সঙ্গে ঘর বেঁধেছে। তাতে ডোম্বি ভেঙে পড়েনি। নদীই ডোম্বির মা বাপ। নদীই তার আশ্রয়। কাহ্নু ডম্বিকে মল্লারী বলে ডাকে। ডোম্বির বাস গ্রামের বাইরে। এযুগেও ডোমেদের বাস গ্রমের বাইরেই হয়। আমরা এ যুগেও ডোমদেরকে কাছে টেনে নিতে পারি নি। মল্লারীকে নিয়ে কাহ্নু গান বাঁধে। মল্লারী কাহ্নুকে নদী পার করে দেয়। কোনো পারানি নয় না। কাহ্নুর লেখা সেই গান কণ্ঠে ধারণ করে পাড়ায় পাড়ায় গেয়ে বেড়ায়। শক্ত সবল ডোম্বির মধ্যে যে প্রাণোচ্ছ্বলতা আছে তা কাহ্নুর ভালো লাগে। ডোম্বির মধ্যে আগুন দেখতে পায় কাহ্নু। সে জানে এই ডোম্বি ঠিক একদিন ব্রাত্যদের প্রতি ব্রাহ্মণদের যে অপমান তার প্রতিশোধ নেবেই।

রাজার শাসন-শোষণ-নিপীড়ন-অত্যাচারে নিম্নবর্ণের অন্ত্যজ মানুষেরা দিশেহারা। কাহ্নুর গীত তাদের কাছে বাঁচার প্রেরণা জোগায়। রাজা বুদ্ধমিত্র অথর্ব। তার মন্ত্রী দেবল মিত্র ব্রাহ্মণ। সে আইন জারি করেছে উচ্চবর্ণের লোকেরা যদি নিম্নবর্ণের মেয়েদের সঙ্গে বউদের সঙ্গে সংসর্গে লিপ্ত হয় তাহলে তা দোষণীয় নয়। এমনকী গর্ভে সন্তান এলেও নয়। তবে তাদেরকে বিয়ে করা নৈব

নৈব চ। যদি কোনো মহিলার যমজ সন্তান হয় তবে তাকে ত্যাগ করতে হবে। কারণ সে বহুগামী তাই সে অসতী। নদীর বড়ো মাছ, জমির ফসল, বনের ফল-মূল রাজার ঘরে উঠবে। এই নিয়ম অমান্য করলে চরম শাস্তি। এইসব আইন দেশাখ, নিমাইরা মেনে নিতে পারে না। তারা প্রতিরোধের জন্য তৈরি হতে থাকে।

একদিন কাহ্নু তার গীত পাঠের জন্য রাজার অনুমতি আদায় করে। সানন্দে সেই কথা প্রথমে মল্লারীকে বলে কাহ্নু। ডোম্বি আনন্দে নেচে ওঠে। শবরীকেও জানায়। তারা সবাই উৎফুল্ল। সবাই ভাবে এতদিনে তাদের কথা রাজার কানে গিয়ে পৌঁছবে। অনেক কাটাকুটি করে সারারাত জেগে কাহ্নু মনের মতো গীত রচনা করে। পরদিন দরবারে পণ্ডিতেরা নানা বিষয়ে আলোচনা শুরু করে। কাহ্নু ডাকের অপেক্ষায় থাকে। রাত নামে। সে গীত পাঠের সুযোগ পায় না। রাজার অনুমতি দানের কথা বললে মন্ত্রী দেবল মিত্র তাকে গলাধাক্কা দিয়ে রাজপুরী থেকে বের করে দেয়। চরম লজ্জায় অপমানে কাহ্নু ভেঙে পড়ে। মল্লারী সব শুনে খেপে ওঠে। বলে,

''তুমি কী করলে?

কিছু করি নি।

মল্লারী তেড়ে ওঠে, কিছু করলে না? মাথা ফাটিয়ে দিতে পারলে না?

তাহলে কি আমাকে আস্ত রাখতো?

না রাখলে মরতে, আমরা সবাই জানতাম তুমি মুখের ভাষার জন্য মরেছো। কুকুরের মতো লেজ গুটিয়ে পালিয়ে যদি আসবে তবে গেলে কেন ওখানে? .... যাকে তুমি প্রাণের চেয়ে বেশি ভালোবাসো তার জন্য মরতে পারো না?''

কাহ্নু প্রতিজ্ঞা করে, সে একদিন তার প্রাণপ্রিয় ভাষাকে বাঁচাতে মরতে হলেও মরবে। ডোম্বিও প্রতিজ্ঞা করে কাহ্নুর এই অপমানের প্রতিশোধ সে নেবেই নেবে।

মন্ত্রীর আইনে ডোম্বির ঘরে ব্রাহ্মণেরা প্রতি রাতে উপস্থিত হয়। দিনে যাদের ছায়া মাড়াও পাপ, যারা জল-অচল, অচ্ছুৎ - রাতে তাদের কাছে উপগত হতে দোষ নেই। এই বিষয় নিয়ে কাহ্নু পদ রচনা করে।

> নগর বাহিরেরেঁ ডোম্বি তোহেরি কুঁড়িআ।
> ছোই ছোই যাইসি ব্রাহ্ম নাড়িআ।।

গীতটি লিখে কাহ্নু খুব আনন্দ পায়। এমন সরাসরি মনের কথাকে এর আগে কখনো প্রকাশ করতে পারেনি। শবরী শুনে থমকে যায়। শবরী চেঁচিয়ে উঠে বলে, ''ঠিকই লিখেছো কানু। ওই এক জায়গায় বামুনেরা ছোটোলোকের শরীরের কথা ভুলে যায়। তখন সব পবিত্র হয়।'' পরদিন সকালে পটহ-মাদল নিয়ে বুনো উল্লাসে মত্ত হয়ে ডোম্বি সমস্ত পাড়া ঘুরে ঘুরে গান করে বেড়ায়। সর্বত্রই দারুণ উত্তেজনা। অব্যর্থ নিশানা যুক্ত তিরন্দাজ দেশাখও বলে যে কানুদা এতদিনে সবার মনের কথা লিখেছে। বুকের ভাষাকে কী করে মুখের ভাষায় পরিণত করতে হয় সে বিদ্যা কানু রপ্ত করেছে। কানুদার স্বাধীন ভূখণ্ডের শরিক হতে সবাই চায়। বামুনদেরকে নিয়ে কানুর গীত মন্ত্রীর কানে পৌঁছয়। প্রহরীরা কানুকে পিছমোড়া করে দরবারে নিয়ে যায়। মন্ত্রী কানুর কাছে জবাব চায়। কানু চুপ করে থাকে। তাকে মৃত্যুদণ্ডের ভয় দেখানো হয়। কানু যদি রাজার প্রশস্তি গীত রচনা করে লেখে - রাজা কত দয়ালু, প্রজাদের সুখের জন্য রাজার প্রাণ কাঁদে, এইসব কথা

তাহলে কানুকে ছেড়ে দেয়া হবে। কানু রাজি হয় না। তাকে চুন ঘরে বন্দী করা হয়।

এদিকে ডোম্বি কানুর অপমানের প্রতিশোধ নেয়। দেবল ভদ্রের ভাগ্নে একদিন রাতে জোর করে ডোম্বির শয্যাসঙ্গিনী হলে ডোম্বির বৈঠা চালানো শক্ত হাতে কোমরের লুকোনো ছুরি উঠে এসে দেবল ভদ্রের ভাগ্নের বুকে সজোরে ঢুকে যায়। চারিদিক রক্তে ভেসে যায়। রাজার কাছে এতবড় কাণ্ডের সংবাদ পৌঁছয়। ডোম্বিকে রাজপ্রহরী ধরে নিয়ে যায়। ডোম্বি আজ খুব খুশি। সে ভয়ডরশূন্য। বিচারে ডোম্বির ফাঁসি হয়। তিনদিন লাশ ঝোলানো থাকে ফাঁসি গাছে।

ডোম্বির খবর কানুর কানে আসে। একমাস চারদিন চুনঘরে বন্দী কাহ্নু। অভুক্ত থেকে গায়ে বল নেই। পা আসাড়। মাথা ঝিম ঝিম করে। সে তার প্রাণের ভাষার, মুখের ভাষার স্বীকৃতি পাবার জন্য লড়ছে। পুনর্বিচারে তার হাত দুটো কেটে নেওয়া হয়। অর্ধমৃত কানুকে দরবার থেকে বাইরে ফেলে দেওয়া হয়। খবর পেয়ে গ্রামের লোকজন অচৈতন্য কানুকে নিয়ে গিয়ে জড়িবুটির সাহায্যে বাঁচিয়ে তোলে। রাজার লোকেরা গ্রামের পর গ্রামে, পল্লিতে পল্লিতে আগুন লাগিয়ে দেয়। দেশাক আর তার বাহিনী তিরধনুক নিয়ে অসম যুদ্ধে হেরে গিয়ে কানুকে নিয়ে বনের মধ্যে আশ্রয় নেয়। এ পলায়ন শুধু আত্মরক্ষার জন্য নয়, নতুন করে শক্তি অর্জনের জন্য। চারিদিকে আগুনের লেলিহান শিখা আর মানুষের চামড়ার পোড়া গন্ধে চারিদিক ভরে ওঠে। কিন্তু তার মধ্য থেকেও সংগ্রামী মানুষের প্রতিরোধের কণ্ঠস্বর সোল্লাসে ধ্বনিত হল। কাহ্নু নতুন করে আবার সেই প্রতিবাদের বীজ বপন করে বলে,

> ‘‘তোরা কেউ দুঃখ করিস না দেশাখ। আমাদের তেমন একটা জায়গা একদিন হবে। আমরাই রাজা হবো। রাজা-প্রজা সমান হবে। আমাদের ভাষা রাজদরবারের ভাষা হবে। তেমন দিনের জন্য আমাদের প্রস্তুত হতে হবে দেশাখ।’’

চামড়া পোড়ার গন্ধ সবার নাকে এসে ঢোকে। সে গন্ধ প্রাণভরে বুকে টেনে হো হো করে হেসে ওঠে ভুসুকু। সে উজ্জীবিত হয়ে বলে ওঠে,

> ‘‘কাহ্নিলা রে আজি ভুসুকু বঙ্গালী ভইলী।’’

১৯৪৭ সালে ভারত এবং পাকিস্তান স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হল। পূর্ব পাকিস্তান যা বর্তমানে স্বাধীন বাংলাদেশ তারাও পাকিস্তানের অন্তর্গত হল। পূর্ব পাকিস্তানের সমস্ত মানুষের প্রাণের ভাষা, আত্মার আত্মীয়, বুকের ভাষা, মুখের ভাষা বাংলা। কিন্তু পাকিস্তান সরকার তাদের ওপর চাপিয়ে দিল উর্দু ভাষা। আপামর বাঙালি জাতিসত্ত্বার এই অপমানকে মেনে নিতে পারল না। লড়াই শুরু হল উর্দুভাষার বিরুদ্ধে। বরকত, জব্বররা প্রাণ দিলেন নিজের প্রণের ভাষাকে প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে। ১৯৫২ সালে রক্তক্ষয়ী অসম সংগ্রামে বহু বাঙালি ভাষা শহীদ হলেন। কাহ্নুর মতো তারাও স্বপ্ন দেখেছিলেন এক স্বাধীন ভূখণ্ডের। যার দক্ষিণে থাকবে এক সুন্দর বন আর সাগর। কাহ্নুর মতো তারাও স্বপ্ন দেখেছিলেন রাজা প্রজায় কোনো ভেদ থাকবে না। সবার মুখের ভাষা হবে রাজদরবারের ভাষা। তারই ফলশ্রুতি যেন ১৯৭১ এর স্বাধীন বাংলাদেশ। যে দেশের জনগণের একমাত্র ভাষা বাংলা। যে সংগ্রাম প্রাচীনকালে শুরু করেছিলেন কাহ্নুরা তারই যান পরিণতি আধুনিককালের স্বাধীন বাংলাদেশের জন্মের মধ্য দিয়ে। এভাবেই সেলিনা হোসেন তাঁর উপন্যাসে সেকালের কাহিনীকে এ কাল পর্যন্ত বিস্তৃত করে এক নতুন কণ্ঠস্বরকে ধ্বনিত করলেন

যার মধ্যে দিয়ে চর্যাপদকে জীবনের আখরে পুনর্নির্মাণ করলেন।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১) নীল ময়ূরের যৌবন - সেলিনা হোসেন ; নয়া উদ্যোগ, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ ১৯০৯
২) চর্যাপদ : সম্পাদনা অতীন্দ্র মজুমদার ; নয়া প্রকাশ, কলকাতা-৬, চতুর্থ মুদ্রণ ১৩৮৮
৩) বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস - সুকুমার সেন ; আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা-৯, সপ্তম সংস্করণ ১৩৮৬
৪) রবিবাসরীয় আনন্দবাজার পত্রিকা ; ১৯/০২/২০১৭
৫) স্মরণিকা ; ১৩তম উত্তর দিনাজপুর জেলা বইমেলা